বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির উষালগ্ন থেকে একজন পথিকৃৎ প্রযুক্তিব্যবসায়ী হিসেবে এই খাতের উন্নয়নে ড. মো. সবুর খান নিরবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশ ও দেশের বাইরের দক্ষ আইটি পেশাজীবীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গত শতকের ৯০-এর দশকে একজন আইটি উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন। তখন তিনি ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স প্রতিষ্ঠা করেন যেটি কম্পিউটার বিক্রির পাশাপাশি আইসিটির প্রশিক্ষণ প্রদান করত। এরপর ড. খান ১৯৯৫ সালে কম্পিউটারে এ্যাসেম্বলিং-এ প্রবেশ করেন এবং বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার সুপার স্টোর ধারণার প্রবর্তন করেন। এখন ড্যাফোডিল গ্রুপের ৩৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এক ডজনেরও বেশি বড় বড় প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ড্যাফোডিল। ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিন দশকের ক্যারিয়ারে ড. খান আইটি খাতে অনেক নতুন নতুন আইডিয়া অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নতুন সময়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ড. মোঃ সবুর খান।

১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতেই তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের প্রথম গোড়া পত্তন হয়

তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে বাংলাদেশের অগ্রগতি কেমন দেখছেন

ড. মোঃ সবুর খান : তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরের অগ্রগতির প্রেক্ষাপট যদি বর্ণনা করি তাহলে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির প্রথম গোড়া পত্তনটা হয়, যখন ট্যাক্স এবং ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রতাহার করা হল। এতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রি শাহ এ এম এস কিবরিয়া সাহেব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির একটা প্রতিনিধি দল আফতাবুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যাসোসিশেনের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে আমিও স্যেভাগ্যবসত সে কমিটির একজন মেম্বার; ১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফিজিক্যালি দেখা করার পর আমরা উনাকে সবকিছু বুঝাতে সক্ষম হই। এবং তখনি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি রিয়েল প্রসারতা লাভ করে। ওই ধারাবাহিকতায় আমরা বিসিএস কম্পিউটার সিটি প্রতিষ্ঠা করার সাহস পাই। অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ১৯৯৮ সালকে যদি আমরা ধরি তাহলে এটা ছিল রিয়েলি তথ্য প্রযুক্তির প্রথম গোড়া পত্তন। তারপর ধারাবহিক প্লানিংগুলো অবশ্যই অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছে। এদিকে জরুরি অবস্থার সময় এসে কিছুটা গতি পায় বলে আমরা মনে করি। কারণ, যেহেতু তথ্য প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় সম্ভাবনাটাই আসে যদি গুড গভর্নেন্স থাকে। আমরা লক্ষ্য করবো যে জরুরি অবস্থার সময় তৎকালিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথমেই একটা বেটার বিজনেস ফোরাম ডেভলপ করে। এবং এই বেটার বিজনেস ফোরাম একটা অটোমেটেড সিসটেম ডেভলপ করে। যার মাধ্যমে প্রত্যেকটা ফাইল প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে ট্রাকিং করা হয় এবং সেখানে বিজনেস কমিউনিটির পিপলদের ইনভাইট করা হয়, গভর্মেন্ট পিপলদের ইনভাইট করা হয়। তো ওই ধারাবাহিকতা প্রধামন্ত্রীর দপ্তর কিন্তু কন্টিনিওশন রেখেছে, যার নাম চেইঞ্জ করা হয় পরবর্তিতে প্রাইভেট পাবলিক পাটনারশিপ (পিপিপি)। যেটাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সভাপতিত্ব করে। একইভাবে আমি বলবো যে এ সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার একটা দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে। পাশপাশি মন্ত্রণালয়ে ভাল নেতৃত্বও কিন্তু একটা গুড ইনিশিয়েটিভ যেমন মোস্তাফা জব্বার সাহেবকে দায়ীত্ব দেওয়া, যেমন জুনায়েদ আহম্মেদ পলক এর মত ইয়াং যুবক লিডারদেরকে সামনে নিয়ে আসা। হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা। সর্বোপরি আমার কাছে মনে হয় ডেভলপমেন্টটা হচ্ছে।

এ সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে বাংলাদেশ ডিজিটাল করার একটা প্রত্যয় ঘোষণা করে। পাশপাশি মন্ত্রণালয়ে ভাল নেতৃত্ব একটা গুড ইনিশিয়েটিভ যেমন মোস্তাফা জব্বার সাহেবকে দায়ীত্ব দেওয়া, যেমন জুনায়েদ আহম্মেদ পলক এর মত ইয়াং যুবক লিডারদেরকে সামনে নিয়ে আসা।

ই-কমার্সের টাল মাটাল পরিস্থিতি উন্নয়নে করনীয় কি আছে

ড. মোঃ সবুর খান : এটা একটা দুর্ভাগ্য, যে ই-কমার্স একটি সবচেয়ে বড় সম্ভাবনার খাত এবং কোভিট-১৯ সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি আমাদের সামনে তুলে নিয়ে আসছিল, ই-কমার্সের প্রসারতা লাভ হচ্ছিল। এবং মানুষ কিন্তু ই-কমার্স গ্রহণ করেছিল। দুর্ভাগ্য হলেও এটা সত্য এটা দুই দিকে সমস্যা আছে যারা ই-কমার্স প্রপাইটর তাদের যেমনি ভাবে সমস্যা ছিল। সরকারের পলিসি দিক থেকেও ছিল। যদি সরকার আরও একটু আগে সচেতন হত। তেমনি গ্রাহকদেরও একটু সমস্যা আছে। গ্রাহকদেরকে অন্য দিক থেকে আমি দোষ দিতে চাই না। কারণ গ্রাহকরা তো বেনিফিট খুঁজবেই। কারণ আমি যখন একটা দোকানে কেনাকাটা করতে যাই, যদি দেখি ৭০ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ড তখন আমারও একটা কৌতুহল তৈরী হয়। ৭০ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ড দিচ্ছে আমি কেন কিনবো না। কিন্তু আল্টিমেটলি ফ্যাক্টরটা কোথায়? এখানে একটি গ্যাম্বলিং হচ্ছে। কিভাবে মানুষের কাছ থেকে সহজে টাকা এনে একট ব্লক তৈরী করা যায়। যার কারণে একটা সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বিতর্কিত হয়ে গেল। আমি মনে করি রিয়েল ইকমার্স প্রপাইটররা কিন্তু এইভাবে প্রতারণা বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়নি। ইকমার্সের যে ধসটা এসেছে তার ব্যাকে গিয়ে লাভ নাই, সমালোচনা করেও কোন লাভ নাই। তবে আমাদের এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রবলেম থেকে কিন্তু সুযোগ তৈরী হয়। শেয়ার মার্কেট ধস থেকে কিন্তু আমরা অনেক ডেভেলপ করেছি। কাগজের শেয়ার থেকে অটোমেটেড হয়। অনেক পলিসি কিন্তু তৈরী হয়েছে। এখন ইকমার্সেও পলিসিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ই-কমার্সের পার-মিশনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সাথে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ইন্ট্রিগ্রিয়েট করতে হবে। অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে মেম্বারশীপ দেয়ার ক্ষেত্রে জবাবদিহি হতে হবে। পেমেন্ট গেটওয়েগুলোর জবাবদিহিতায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। যাক সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই হয়েছে। আর যেনো কোন অসাধু ব্যবসায়ী সুযোগ না নিতে পারে। সেদিকে সচেতন থাকতে হবে।

বাংলাদেশ কিন্তু ভেরি ইমোশনাল কান্ট্রি। আমাদের বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমরা এমন একটা জাতি হুজগে জাতি বলি আমরা। যখন কেউ বলে

যে আমি ই-কমার্স থেকে বিরাট একটা বেনিফিট পেয়েছি তখন আমরা হুড়াহুড়ি করি। এই জায়গাগুলোতে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। আমি বলতে চাচ্ছি যারা সৎ ব্যবসায়ী তারা কোনভাবেই যেন কোন অবস্থাতেই এ টালমাটাল দেখে সরে না পড়ে। তাহলে জাতির জন্য খুব দুর্ভাগ্য হবে। বাংলাদেশে এখনো অনেক ভাল মানুষ আছে, ভাল উদ্যোক্তা আছে, অনেক ভাল ইনিশিয়েটিভ আছে। সেইগুলো যেন বিতর্কিত না হয় এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পে ২০২১ সার্বিকভাবে কতদুর বাস্তবায়িত হল

ড. মোঃ সবুর খান : ২০২১এর যে গাইডলাইন গভর্মেন্ট সেট করেছে সেটি একটি ওয়ান্ডারফুল গোল। সেটি হয়তো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। এটার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, পলিসিগুলো ইমপ্লিমেন্ট দরকার ইনফ্যাক্ট ডেভলপ করা দরকার। ডাটা সেন্টার দরকার। আমরা যদি বলি ব্যান্ডউইথের দাম কমানো, মোবাইল অপারেটিং যেমন ৪জি অপারেটিং করা। এবং আই জি এস এবং বঙ্গবন্ধু সাটেলাইট স্থাপন করা। সবকিছু মিলায়ে ২০২১এ আমার কাছে মনে হয় অনেক দুরের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি এখন কিন্তু বেনিফিট নেওয়ার বা পাওয়ার সময়টা আসছে।

সবকিছু মিলায়ে ২০২১এ আমার কাছে মনে হয় অনেক দুরের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি এখন কিন্তু বেনিফিট নেওয়ার বা পাওয়ার সময়টা আসছে। আমরা কিন্তু লক্ষ করতে পারছি বিদেশি বিনিয়োগ আসছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের মধ্যে কিন্তু বোধ জন্ম নিয়েছে আমরা যদি ভাল কম্পানিগুলোকে সাপোর্ট করি, ভাল উদ্যোগক্তাকে সাপোর্ট করি তা হলে হয়তো আমাদের পক্ষে অনেক দুর যাওয়া সম্ভব।

আমরা কিন্তু লক্ষ করতে পারছি বিদেশি বিনিয়োগ আসছে। এনআরবি বাংলাদেশিরা বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের মধ্যে কিন্তু বোধ জন্ম নিয়েছে আমরা যদি ভাল কম্পানিগুলোকে সাপোর্ট করি, ভাল উদ্যোক্তাকে সাপোর্ট করি তা হলে হয়তো আমাদের পক্ষে অনেক দুর যাওয়া সম্ভব।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রতিযোগিতায় টেক্কা দিতে দেশীয় আইটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি কেমন ?

ড. মোঃ সবুর খান : প্রযুক্তির উন্নয়নের জায়গাটাতে আমরা একটু পিছিয়ে আছি। কারণ আমরা আরএনডি যাকে বলি বা ল্যাব; এ বিষয়ে আমরা কিন্তু এখনো পিছিয়ে আছি। এগুলোর পিছনে আমাদের পলিসি দায়ী ছিল। আমরা জানি যে লোকাল ইন্ডাসট্রিকে এনকারেজ করার জন্য গভমেন্ট ইতিমধ্যে যে পলিসিগুলা নিয়েছে সেগুলি বাস্তবায়িত হতে একটু ধীরগতী। আমরা আশা করি যে, গভর্মেন্ট ইতিমধ্যে ওয়ানস্টপ সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করেছে বিশেষ করে হাইটেক পার্কে। এই জায়গাগুলোতে আমাদের স্পিডআপ করার দরকার।

আমি প্রায় দেখি বিভিন্ন মিডিয়ার বদৌলতে ভাল ভাল ইয়াং ছেলে-মেয়েরা উন্নত নানান প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। আমার মনে হচ্ছে গভর্মেন্ট বা প্রাইভেট সেক্টর দুই পক্ষকেই এখানে হাতে হাত রেখে কাজ করা উচিৎ। গভর্মেন্টকেও কিন্তু এনকারেজ করা উচিৎ। প্রযুক্তিগুলো যদি কোন প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে তাদেকে যদি উন্নয়ন করার সুযোগ করে দেয়। তাহলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলো উন্নয়নের জন্য প্রতিযোগিতায় ভালভাবে টিকে থাকতে পারবো। তার কারণ অর্থ থাকলেই প্রযুক্তি উন্নয়ন হয় আমি এটা বিশ্বাস করিনা।

আমার কাছে মনে হয়েছে সারা পৃথিবীতে যত উন্নয়ন হয়েছে ইয়াংরা, নতুনরা করেছে। ইনোভেটিভ পিপলরা করেছে। ইনোভেটিব পিপলরা বিত্তশালী হবার পর আর ইনোভেশনে মনযোগ থাকেন। আমি আমাকে দিয়েই উধাহরণ দেই আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে ব্যাবসা শুরু করি ১৯৯০ সালে। তখন আমার যে কনসেনটেশন, আমার যে আরএনডি করার ঝোঁক ছিলো এখন কিন্তু আর আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। কারণ আমাকে এখন অলওয়েজ লুক আপটার করতে হয় ম্যানেজমেন্ট, ফিনিন্সি এ্যানালাইসিজ, স্ট্যাটেজি এসব দিকে এখন আমার সময় দিতে হয়। তার মানে নতুন যারা ইয়াং চ্যালেঞ্জকে নিতে পারে আমি তাদের কথা বলছি। এদরকে যদি নিয়ে আসি সম্ভবত প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমরা পজিশন তৈরি করতে পারবো। আর্ন্তজাতিক কোম্পানি যারা ফান্ডিং করে তারা কিন্তু সব সময় চেষ্টা করে যাতে নতুনরা উঠে আসে। এদেরকে ফান্ডিং করা হেল্প করা। আমাদের মত যারা ৩২বছর ব্যবসা করে একটা জায়গায় চলে আসতে পেরেছি। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যে কিন্ত এই অপর্চুনিটি থাকবে না। এখন আমাদেরও ভুমিকা রাখতে হবে। আমাদেরকেও চেষ্টা করতে হবে ইয়াংদের সামনে নিয়ে আসা।

দেশীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের কি ধরণের বাধার মুখে পড়তে হয়?

ড. মোঃ সবুর খান : দেশীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান করার জন্য পলিসিগুলো মাত্র শুরু হল। কাজগুলি কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র দপ্তর থেকে এটুআই; এরা দুই পক্ষ, গত ৩/৪ বছর ধরে কাজ করছে। তার ভিতর করোনার কারনে কিন্তু আমরা পিছিয়ে গেলাম। নতুন উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা এসেম্বলিং মেনুফেকচারিং করে, নতুন ভ্যালু এডিশন করে বা ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট তৈরি করে; তাদেরকে সম্ভবত আরো একটু স্পিডআপ করতে হবে। অনেক সময় ইম্পোর্ট কাস্টমস বা রিলেটেড যে ফ্যাক্টরগুলা আছে সেখানে বাধার সম্মুখিন হতে হয়। স্বাভাবিকভাবে এনবিআর বা ট্যাক্স অথরিটির সবসময় দায়িত্ব থাকে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আরও বেশি ট্যাক্স আদায় করা যায়।

আমরা কিন্তু নতুন নতুন অনেক উদ্যাক্তাকে লক্ষ করেছি এসব চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেও প্রতিযোগিতার বাজারে তারা টিকে আছে। আমি বলব যে বাঙালি জাতি হিসেবে চ্যালেঞ্জিং ব্যবসায়িক মন-মানুষিকতা আছে। সুতরাং এই জায়গাতে গভর্মেন্ট থেকে সাপোর্ট দিতে হবে। একটু উদার মনোভাব থাকতে হবে। তহলে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি ভাল করতে পারবে।

আর্ন্তজাতিক বাজারে দেশীয় আইটি পণ্যের চাহিদা বাড়াতে সরকারের কোন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার ?

ড. মোঃ সবুর খান : আর্ন্তজাতিক বাজারে আইটি পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বিদেশে আমাদের আইটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুযোগ করে দিতে হবে। তারা যাতে বাইরে প্রতিষ্ঠান খোলার সুযোগ পায়। একটি উদারণ হিসেবে তুলে ধরতে চাই ২০০২ সালে যখন আমি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি ছিলাম তখন কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালিন সচিবসহ আমরা অনেককে নিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। তখন যেহেতু আইটি মন্ত্রণালয় ছিলনা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। সিলিকন ভ্যালিতে একটি অফিস স্থাপন করার জন্য। আমিসহ আমরা সেখানে একটা অফিস প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারিনি। যদি টিকে যেতাম তাহলে আর্ন্তজাতিক বাজারে একটা ভাল অবস্থান তৈরী করতে পারতাম। আমি যদি বলি নিউয়র্কে আমার একটা অফিস থাকবে, সেখানে ১০/১৫ জন লোক লাগবে। কিন্তু তার বাইরে থাকবে ৫-১০ হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ঢাকাতে। বিদেশে বসে তারা কাজ নিয়ে বাংলাদেশে দিবে। যেটা আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র খুব সাকসেসফুলি করতে পেরেছে। তারা কিন্তু মার্কেটিং করার জন্য লোক নিয়োগ করে রাখছে। এখান থেকে তারা কল রিসিভ করছে। ওখান থেকে কম্পানিটাকে রান করে।

দেখা গেছে, নিউইয়র্কে কোন কম্পানিকে অর্ডার দিয়েছি তখন ইন্ডিয়ানরা

এখানে ছোট ছোট ভাগ করে নিয়েছে। বাংলাদেশের উদ্যাগক্তা বাইরে গিয়ে কম্পানিটাকে সেটাপ করবে। সেক্ষেত্রে দেশি আইটি পণ্যের চাহিদাটা বাড়বে। এই জায়গাটাতে সরকারকে ভাল উদ্যোগটা নিতে হবে। সরকার যদি ব্যক্তিগত ভাবে ওই আইটি কম্পানিগুলোকে বলে তোমরা যদি বাইরে সেটাপ করো ১/২লক্ষ ডলার নিতে পারবা। এটা আবার একাউন্টে থাকবে কারণ এটা নিয়ে প্রতারকরা অন্য কাজে না লাগাতে পারে। তার জন্য আবার একটা জবাবদিহিতা থাকতে হবে। জবাবদিহিতা থাকলে দেশীয় আইটি পণ্যগুলি কিন্তু আর্ন্তজাতিক বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তা বিধিতে কোন ধরনে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী?

ড. মোঃ সবুর খান: আমরা জানি ফিনান্সিয়াল সেক্টর থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এখন অনলাইনে চলে আসছে। নিত্যনৈমিত্তিক, ব্যাক্তিগত ফাইল, কমনিকেশন সবকিছুই চলে আসছে অনলাইনে। আমরা এক এক অপরের সাথে কথা বলছি ফাইল ট্রান্সফার করছি সবকিছুই একটা অনলাইন প্লাটফর্মে চলে আসছে। সেই কারণে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি বা সাইবার ল এর ইমপ্লিমেন্টেশনে একটু বেশি করে নজর দিতে হবে। এই যে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা বড় রকমের অর্থ লস করলাম, এটাও প্রমান যে আমাদের সাইবার সিকিউরিটিতে আরো সতর্ক হতে হবে। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যারা সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে গবেষণা বা কাজ করে উয় জেনারেশন তাদের নিয়ে একটি সাইবার সিকিউরিটি ন্যাশনাল সেল গঠন করা যেতে পারে।

আমরা জানি যে আমাদের সরকার ঘোষণা দিয়েছে তারা আগামীতে ক্যাশলেস সোসাইটি দেখতে চায়, আমি মনে করি ভেরী গুড ইনিসিয়েটিভ। ইতোমধ্যে আমরা যেসকল প্রতারণার অভিজ্ঞতা নিলাম, ক্যাসলেস সোসাইটি করতে গিয়ে যাতে করে কেউ প্রতারণার সুযোগগুলি না নিতে পারে। আমরা জানি যে প্রতারকরা সবসময় বসে থাকে এই ধরণের কিছু বের করার জন্য কোন কোন জায়গায় দুর্বলতা আছে, পলিসি দুর্বলতা আছে, সিস্টেম দুর্বলতা আছে। কারণ আমরা জানি যে হঠাৎ করে একটা ওয়েবসাইট হ্যাক করে দিয়ে, বা পার্সনাল সোসাল নেটওয়ার্কে হ্যাক করে দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়। তারা হ্যাক করে দিয়ে গ্রাহককে বলে আপনি যদি ফিরে পেতে চান তাহলে এত টাকা দিতে হবে। এই জন্যে সাইবার সিকিউরিটির মাধ্যমে যদি তাদের আইডেন্ডিফাই করা যায় তাহলে তারা এই ধরণের কাজ করতে সাহস পাবে না। যেমন আমরা বাইরের যে একাউন্ডগুলাতে কাজ করি যদি কেউ সে আইডিগুলাতে নক করে বা ২-৩বার ট্রাই করে তাৎক্ষনিক তারা আমাদের ম্যসেজ দেয় বা জানিয়ে দেয়। আপনার একাউন্ড এর পাসওয়ার্ড হ্যাক করার চেষ্টা হচ্ছে। আপনি আপনার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুণ।

আমাদের এখানে হয়ত ওইরকম প্রযুক্তি নাই। এই জায়গাটাকে আমাদের এগুতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক যে লসটা করল সাইবার সিকিউরিটিতে যদি আমরা টাকা ব্যায় করতাম তাহলে এই লসটা কোনভাবেই হওয়া সম্ভব ছিল না। বিদেশে আমরা দেখেছি বড় বড় কোম্পানিগুলো সাইবার সিকিউরিটিতে অনেক উন্নত। আমরা যদি গুগলের দিকে তাকাই, এডব্লিউএস এর দিকে তাকাই, আইবিএম এর দিকে তাকাই, বড় বড় সার্ভার যেমন অ্যামাজন; তারা ডাটা সেন্টারকে ঠিক রাখার জন্য সাইবার সিকিউরিটিতে তারা যথেষ্ট এলার্ট। দেখেন সম্প্রতি ফেসবুক ৬ঘন্টা অফ থাকার জন্য নাকি কত হাজার কোটি টাকা লস করেছে। এটাও কিন্তু আমরা লক্ষ করলে বুঝবো যে এখানে একটা ঘুর্ণিঝড় ফেসবুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। ফেসবুক কিন্তু এত শক্তিশালি সাইবার প্রতিষ্ঠান হয়েও সাইবার হামলার প্রটেকশন তারা নিতে পারেনি। আমরা ভিতরের ব্যপারগুলো জানিনা একটা সময় হয়ত বের হয়ে আসবে।

আমাদের সরকার যদি এই সকল বিষয়ে নজর দেন। তাহলে মনে হয় সাইবার সিকিউরিটি এবং অনলাইন সিকিউরিটি ইস্যুতে আমরা সফল ভাবে কাজ করতে পারবো। ধন্যবাদ।

শেখ রাসেল আজকের শিশুর প্রেরণা

মোহাম্মদ খালিদ হাসান

আজ শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মদিন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়িতে ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর শিশু রাসেল যখন জন্মগ্রহণ করেন, আমরা জানি তখনকার পরিস্থিতি ছিল রীতিমত উত্তেজনাকর। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে। যখন কঠিন অনিশ্চয়তা আর অন্ধকারের মাঝে নিপতিত এ অঞ্চলের মানুষ, বঙ্গবন্ধুর ব্যস্ততা অব্যখ্যনীয়। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন, ঠিক তখনই মুজিব-ফজিলাতুন্নেছার ঘর আলোকিত করে জন্ম নিল এক ছোট্ট শিশু যার নাম 'রাসেল'।

সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেঝ ফুফু মা'র সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেঝ ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখবো। ফুফু বললেন, তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালোচুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড় সড় হয়েছিল রাসেল।'

রাসেল ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে, বঙ্গবন্ধু ও পরিবারে আদর একটু বেশিই ছিল তার, পিতা বঙ্গবন্ধু তাকে ভালোবাসতেন খুব। বাসায় ফিরে ঘরে ঢুকে বাবা প্রথমেই খুঁজতেন রাসেলকে। রাসেল, রাসেল বলে ভরাট কণ্ঠে ডাক দিতেন তার নাম ধরে। রাসেলও বঙ্গবন্ধুকে প্রচণ্ড ভালোবাসত। বাবাকে কাছে পাওয়ার জন্য, বাবার কোলে চড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকত সব সময়। বাবার ডাক শোনার সাথে সাথেই এক দৌড়ে ছুটে আসত বাবার কাছে। অনেকক্ষণ পর বাবাকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরত, কিংবা উঠে পড়ত কোলে।

বঙ্গবন্ধু তাকে কোলে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন পরম আদরে। বাবার চশমাটাকে দারুণ লাগত তার, তাই সেটা বাবার চোখ থেকে খুলে নিজের চোখে লাগিয়ে নিতে বেশ মজা লাগত ওর। গল্প শুনতে খুবই ভালোবাসত ছোট্ট শেখ রাসেল। বাবা অবসরে থাকলেই গল্প শোনানোর জন্য আবদার জুড়ে দিত, বঙ্গবন্ধুও সময় পেলে বেশ আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনাতেন।

বঙ্গবন্ধু তাকে শুনাতেন একটি নিপীড়িত দেশ ও তার মানুষ এবং সংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীনতা অর্জনের গল্প। এসব গল্প শুনে হয়তো রাসেলেরও ইচ্ছা জাগত মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার, যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করার। রাসেলও গল্প শোনাত তার বাবাকে। রাসেল বরিশাল, ফরিদপুর ও ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ও উর্দু মিশিয়ে শিশুসুলভ কথা বলত রাসেল। রাসেলের কথা বলার ভাষা শুনে বাবা হেসে উঠতেন, চেষ্টা করতেন জগাখিচুড়ি ভাষায় জবাব দিতেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠতেন একজন প্রিয় পিতা। পিতা-পুত্রের আনন্দঘন আড্ডায় পুরো বাড়ি যেন স্বর্গ হয়ে উঠত।

শেখ রাসেল তার স্বল্প সময়ের জীবনে শিশুদের জন্য অনেক অনুকরণীয় কিছু রেখে গেছে। যেখান থেকে আমরা আমাদের শিশুদের প্রেরণা দিতে পারি।